



কোয়ান্টাম বুলেটিন

ফেব্রুয়ারি ২০২০

সাদাকায়নের বিশেষ আলোচনায় গুরুজী সন্তানের কাছ থেকে যা আপনি প্রত্যাশা করেন তা আপনার মা-বাবার জন্যে করুন

পরিশীলিত মানুষ
হয়ে ওঠার জন্যে
কোয়ান্টামের নতুন বই

শুদ্ধাচার
মহাজাতক

আপনি আপনার মা-বাবার সাথে যে আচরণ করেন, তাদের প্রতি যে মমতা অনুভব করেন, আপনার সন্তান সেটা দেখছে এবং সে-ও আপনার সাথে একই আচরণ করবে। কথা কিংবা উপদেশ নয়, সন্তান অনুসরণ করে আপনার কাজ ও আপনার আচরণ। তাই সন্তানের কাছ থেকে যা আপনি প্রত্যাশা করেন তা আপনার মা-বাবার জন্যে করুন।

গত ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বার্ষিক আর্ডেন্টিয়ার ওয়ার্কশপের শুরুতে বিশেষ সাদাকায়ন-আলোচনায় একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

গুরুজী আরো বলেন, পরিবার থেকেই ঘটে আমাদের যাবতীয় শিক্ষার সূচনা। পরিবারকে ঘিরেই আমাদের বেড়ে ওঠা। আর পরিবারের শুরুটা হয় মা-বাবাকে দিয়ে। তারপর স্বামী/স্ত্রী এবং এর পরের ধাপ হলো সন্তানসন্ততি। অর্থাৎ পরিবারের শুরু হচ্ছেন

মা-বাবা। মমতা, দায়িত্ববোধ ও সেবার ক্ষেত্রে আপনি যদি এই ধারাক্রম অনুসরণ করেন, আপনার সন্তানও তার জীবনে একই ধারাক্রম অনুসরণ করবে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তখন দেখা যাবে—আপনার সন্তানও আপনার প্রতি তেমন মমতা ও দায়িত্ব অনুভব করবে।

সবসময় মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার তার মা-বাবার। তাই দায়িত্ব পালনের বেলায় নিজ স্ত্রী-সন্তানের চেয়েও একজন পুরুষের অগ্রাধিকার দিতে হবে

তার মা-বাবাকে। আর পরিবারে স্বামী/স্ত্রী দুজনকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার স্বামী/স্ত্রীর মা-বাবা আমারও মা-বাবা। এটাই ধর্মের শিক্ষা। এটাই মহামানবদের শিক্ষা।

‘আমার সেবা পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?’—এক সাহাবীর এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে নবীজী (স) প্রথম তিন বার বলেন, ‘তোমার মা’। চতুর্থবারে বলেন, ‘তোমার বাবা’। এ হাদীস থেকে সহজেই বোঝা যায় আমাদের জীবনে মা-বাবার অবস্থান। আমাদের বেড়ে ওঠা ও লালনপালনে মা-বাবার শ্রম ও মমতার গুরুত্ব কতখানি, সেটা তারাই বুঝতে পারেন—যারা শৈশবে মা-বাবার স্নেহ-মমতা-সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দুঃখজনক হলেও সাধারণভাবে দেখা যায়—যারা এটা পান এবং একটু বেশি পান, তারা অধিকাংশ সময়ই এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন না।

সন্তান যদি দেখে—আপনি কখনো আপনার মা-বাবার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নি, সবসময় সদাচরণ করেছেন ও সহিষ্ণু থেকেছেন, তাহলে সেটাই হবে তার জন্যে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আপনি সন্তানের আদর্শ হতে পারবেন। সে-ও আপনার সাথে একই আচরণ করতে শিখবে। প্রাকৃতিক নিয়মে নিজ নিজ কর্মের পুরস্কার প্রতিটি মানুষই পায়।

আর আপনার শিশুসন্তান যখন কোনো কথা বার বার বলে বা প্রশ্ন করে, তখন যদি আপনি বিরক্ত না হন, তবে মা-বাবার এমন আচরণে কেন বিরক্ত হবেন? মা-বাবা যখন বার্ষিক্যে পৌঁছান তখন তারাও তো উপনীত হন জীবনের দ্বিতীয় শৈশবে।

সন্তানের জীবনে মা-বাবার দোয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবার দোয়া পেয়েছি বলেই আমরা কল্যাণ ও শান্তির এই আলোকিত পথে আসতে পেরেছি। সবাই মিলে একসাথে এগোতে পারছি।

আসলে মা-বাবার আশীর্বাদের চেয়ে মূল্যবান ও কল্যাণকর আর কিছু হয় না।

তাই নিজেদের জন্যে আমরা সবসময় এটাই চাইব—প্রতিমুহূর্তে মা-বাবার দোয়া নিয়ে যেন আমরা পৃথিবীতে চলতে পারি, গড়তে পারি সার্থক জীবন। আর যাদের মা-বাবা ইতোমধ্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে আমরা যেন সবসময় দোয়া ও সংকর্ম করতে পারি। সন্তান হিসেবে এটা আমাদের কর্তব্য।



ফাউন্ডেশন প্রকাশিত এ স্টিকারগুলো বছরের শুরু থেকেই সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে শুদ্ধাচার। দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর, পরিশীলিত ও শান্তিপূর্ণ করে তুলতে এ বইটিতে রয়েছে হাজারেরও বেশি সূত্র। গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক প্রণীত এ বইটি ১৩ ফেব্রুয়ারি মেলায় আসার পর থেকে লাভ করেছে সর্বস্তরের সব বয়সী পাঠকের সমাদর।

শুদ্ধাচার চর্চা জীবনকে করে তোলে প্রশান্তিময় ও সার্থক। দৈনন্দিন জীবনের কোথায় কীভাবে কী করণীয় তা ১৮টি অধ্যায়ে ধাপে ধাপে উঠে এসেছে এ সংকলনে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের প্রকাশনা এই প্রথম।

বইটি সংগ্রহ করুন। শুদ্ধাচার চর্চা শুরু হোক পরিবার থেকে। ছড়িয়ে পড়ুক সমাজে। সম্মিলিত শুদ্ধাচার চর্চায় গড়ে উঠুক একটি সমমর্মী, সহিষ্ণু ও মানবিক মহাসমাজ।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৬৮ তম কোর্স ৥ চট্টগ্রাম

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ মার্চ

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : র্যাডিসন ব্লু, চট্টগ্রাম

৪৬৯ তম কোর্স ৥ ঢাকা

২০, ২১, ২২ ও ২৩ মার্চ

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

১৩ জানুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৯৭ তম আসরে আমন্ত্রিত হন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব ও অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার। তাদের আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রাক্তন সচিব। অধ্যাপনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিন্সাপুর এবং বাংলাদেশে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি ব্যবসা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কী-স্টোন রিসার্চের এমেরিটাস এডভাইজার এবং কী-স্টোন ট্রেমাসিক সাময়িকীর সম্পাদক।



একুশে পদক ২০২০-এ ভূমিত প্রথিতযশা চিকিৎসক, মামা'স ইনস্টিটিউট অব ফিল্ট্রা এন্ড ওমেনস হেলথের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ রোধে বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত সায়েবা'স মেথডের উদ্ভাবক। ২০০৩ সালে এ পদ্ধতি বাংলাদেশের জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর প্রসূতিমুহুর হার নেমে আসে অর্ধেক। সহজলভ্য ও কার্যকরী এ পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশ্বের ১৫টিরও বেশি দেশে।

অন্যের জন্যে কাজ করতে হবে নিয়মিত

ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান

ঢাকার অদূরে ধামরাইতে 'শৈলান প্রবীণ নিবাস' নামে একটি বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি আমি ও আমার সহধর্মিণী। কারণ আমাদের দেশে প্রবীণরা খুব অসহায়। এর মধ্যে প্রবীণ মহিলাদের অবস্থা বেশি শোচনীয়। বয়স হলে মা-বাবা তাদের সন্তানদের কাছে থাকবে, এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে সবসময় তেমনটা হয় না। আমাদের লক্ষ্য—অসহায় প্রবীণরা যেন এখানে আশ্রয় ও যত্ন পায়, জীবনের বাকি দিনগুলো যেন তাদের আনন্দে কাটে।

এক ধরনের অপরাধবোধ থেকেই আমি এ কাজটা শুরু করেছি। কারণ জীবনের এ পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করলাম—অন্যের জন্যে তো কিছুই করা হলো না! সাধারণত আমরা মনে করি, সারাজীবন আমরা অন্যের জন্যে কাজ করি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কর্মজীবনে দায়িত্বের সূত্রে যে কাজগুলো করছি, তা-তো অন্যদের জন্যেই করছি। কিন্তু সত্য হলো, এর সাথে ব্যক্তি-স্বার্থ জড়িত থাকে। কারণ বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও নানা সুযোগ-সুবিধা আমরা পাই। তাই এ কাজকে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ বলা যায় না। আমার নিজস্ব ভাবনা হলো, যে কাজে বাধ্যবাধকতা আছে, যে কাজের বিনিময়ে আমাদের কিছু প্রাপ্তির সুযোগ থাকে বা আকাজক্ষা থাকে, সেগুলো আসলে নিঃস্বার্থ কাজ নয়।

প্রশ্ন আসতে পারে, নিঃস্বার্থভাবে অন্যের জন্যে আমরা কেন কাজ করব? আমার সময়, সম্পদ ও সেবার ওপর মানুষের দাবিটা কোথায়? সত্য হলো, আমরা কেউ যদি রবিনসন ক্রুসোর মতো নির্জন একটি দ্বীপে আটকা পড়ি কখনো, তখন কিন্তু আমাদের বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স কোনো কাজে আসবে না। একাকী দ্বীপে কতগুলো সূর্যাস্ত আনন্দ নিয়ে দেখব আর কতক্ষণই-বা সমুদ্রে সাঁতার কাটব? অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্যে এবং ভালো থাকার জন্যে সমাজের সবার ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা থাকে। পরিচিত-অপরিচিত সবার সাহায্য নিয়েই আমাদের চলতে হয়, বেঁচে থাকতে হয়।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের কাজের পাশাপাশি যতটুকু সময় ও সুযোগ আমরা পাই, অন্যের জন্যে তা ব্যয় করা। সবাইকে যে বড় আয়োজন করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, তা নয়। অনেক ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমেও আমরা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারি। আমরা সবাই যদি সবার পাশে দাঁড়াই, সবার জন্যে করি তাহলে সমাজটা এরকম থাকবে না।

যে-কোনো জাতীয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের জন্যে আমরা সবাই কমবেশি কিছু না কিছু করি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। নিজের চিন্তার ভেতরে এ বিষয়টি সবসময় রাখতে হবে যে, আমি অন্যের জন্যে কিছু করব এবং তা হতে হবে নিয়মিত।

নিঃস্বার্থভাবে যা করি, তা-ই প্রকৃত সঞ্চয়

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার

অন্যের জন্যে কিছু করার প্রসঙ্গে আমার ধ্যানধারণা কিছুটা ভিন্ন। সারাজীবন পরিবার-পরিজন, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-বন্ধুর জন্যে বা পেশাগত দায়িত্ব পালনে আমরা যা করি তা আসলে নিজের জন্যে করা নয়। বরং যা আমরা সেবার মানসিকতা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্যে করি, সেটাই হলো প্রকৃত অর্থে নিজের জন্যে কিছু করা। কারণ কোনো প্রাপ্তির আশা ছাড়া সং নিয়তে যা আমরা করি, এই ভালো কাজটুকুই আমাদের প্রকৃত সঞ্চয়। এরই সুফল আমরা পাই পৃথিবীতে এবং পরপারে।

আমরা যত ভালো কাজ করি, সেই কাজের ফলাফল আমরা যেমন পাই, আমাদের সন্তানরাও পায়। মন্দ কাজের বেলায়ও তা সত্য। একজন কর্মজীবী মা হয়তো ভাবছেন, সন্তানের পরীক্ষা আছে, আজ একটু দেরি করে অফিসে যাব কিংবা সময়ের আগেই অফিস থেকে বের হবো। মনে রাখতে হবে, যে মা তার কাজে ফাঁকি দিচ্ছে সন্তানের ভালো রেজাল্টের আশায়, সন্তানের ভালো রেজাল্ট বা ভবিষ্যৎ কিন্তু সেই মায়ের ওপর নির্ভর করে না; বরং সেটা নির্ভর করে মা-বাবার ভালো কাজের ওপর, সততার ওপর এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমতের ওপর। আর আল্লাহ সবকিছুই দেখছেন। তাই ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, অন্যের সেবায় কাজ করতে হবে।

আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখব—একবেলার খাবার আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে কত মানুষের শ্রম আর অবদান রয়েছে! কেউ ফসল ফলিয়েছে, কেউ শস্য মাড়িয়েছে, কেউ বাজারে গিয়ে তা বিক্রি করেছে, কেউ আমাদের জন্যে রান্না করেছে। এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কত মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ! তাই অন্যের জন্যে কিছু করা মানে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার একটা সামান্য প্রয়াস।

আসলে আয়োজন করে অনেক সরঞ্জাম দিয়ে সেবা করতে হবে, এমনটা ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে দৃষ্টিটা সবসময় উন্মুক্ত রাখতে হয়, হৃদয়টা প্রসারিত করতে হয়।

তরুণদের আমি সবসময় বলি—তোমরা যে কাজই করো, মনোযোগ দিয়ে করো, ভালোভাবে করো, আনন্দ নিয়ে করো। এতে চারপাশের মানুষ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি তোমাদের নিজদেরও কল্যাণ হবে। সেইসাথে মানুষের গুণগুলো দেখতে শেখো। যারাই জীবনে সফল হয়েছেন, বড় কিছু করেছেন, তাদের গুণগুলোকে আয়ত্ত করতে শেখো।

আমার বিশ্বাস—কোনো বড় কাজ বা ভালো কাজ কখনো একা করা যায় না। এজন্যে সম্ভব হতে হয়। আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই মানবসেবায় তরুণদের অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্যে এবং তাদেরকে ভালো কাজে সম্ভব করার জন্যে।

খেজুর খান ॥ থাকুন সুস্থ ও তারুণ্যদীপ্ত

প্রাকৃতিক খাদ্যসম্ভারের এক অনন্য উপহার খেজুর। ফল হিসেবেই খান কিংবা মূল খাবারের বাইরে স্ন্যাকস হিসেবে—যেভাবেই খান, খেজুর মাত্রই উপকারী—নানা কারণে, নানা ভাবে।

আমাদের দেশে একটা সময় শুধু রমজান মাসে খেজুর পাওয়া যেত, তা-ও দু-তিন ধরনের বেশি নয়; এখন সারা বছর নানান জাতের খেজুর পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি উন্নত প্রজাতির খেজুরের চাষও হচ্ছে ব্যাপকভাবে। ফলে ভালো জাতের খেজুর শুধু মরুভূমিতেই জন্মায়—এ ধারণাতেও এসেছে পরিবর্তন।

বাংলাদেশ কৃষি অধিদপ্তরের কৃষি তথ্য সার্ভিসের (এআইএস) মতে, দেশের সব জেলাতেই খেজুর চাষ সম্ভব। তবে বেলে দো-আঁশ মাটি অধিক উপযোগী বলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এবং পার্বত্য জেলাগুলোতে সৌদি খেজুর চাষ সম্প্রসারণ করার সুযোগ আছে। এ-ছাড়া খেজুর গাছ যেহেতু বৈরি আবহাওয়া বা খরা সহ্য করতে পারে, বরেন্দ্র অঞ্চলেও এর চাষ সম্প্রসারণ করা যাবে।

একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীজুড়ে খেজুরের প্রতি মানুষের আগ্রহের অন্যতম কারণ এর নিরাময় গুণ। বিভিন্ন ক্রনিক ব্যাধি যেমন : হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং ক্যান্সার নিরাময় ও প্রতিরোধে চিকিৎসকেরা দেখেছেন, খেজুর বেশ কার্যকর। দৈনন্দিন খাবার তালিকায় তাই খেজুর রাখুন। আপনি সুস্থ থাকবেন।

ভ্রমণের সময় সাথে খেজুর রাখুন। চকলেট, চিপস ও প্যাকেটজাত স্বাস্থ্যঘাতী স্ন্যাকসের পরিবর্তে কয়েকটি খেজুর খেয়ে পানি পান করুন। আপনার এনার্জি লেভেল বাড়বে। ক্লান্তি জয় করে দীর্ঘক্ষণ সতেজ থাকবেন আপনি। বিয়ের অনুষ্ঠান, জন্মদিন, নবজাতকের আগমন, সাফল্য সংবাদ ও আনন্দ উদযাপনে চিনিজাত মিষ্টির বদলে পরিবেশন করুন খেজুর। এতে স্বাস্থ্যকর খাবারের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

খেজুরের প্রধান খাদ্য উপাদান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

এনার্জি	২৭৫ কিলোক্যালরি
প্রোটিন	২.৫ গ্রাম
লিপিড (ফ্যাট)	০
কার্বোহাইড্রেট	৭৫ গ্রাম
(ন্যাচারাল সুগার ৬২.৫ গ্রাম)	
(ফাইবার)	৭.৫ গ্রাম
আয়রন	০.৯ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	৪০ মিলিগ্রাম
পটাশিয়াম	৬৫৫ মিলিগ্রাম
সোডিয়াম	০
কপার	০.২৫ মিলিগ্রাম
কোলেস্টেরল	০

সূত্র : ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার

বিস্ময়কর নিরাময়গুণে অনন্য

ভিটামিন এ ও বি কমপ্লেক্সের অন্যতম উৎস খেজুর। পাশাপাশি রয়েছে ভিটামিন সি ও ডি—যা ত্বককে কমণীয় ও মসৃণ করে। এর এন্টি-অক্সিডেন্ট ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া ঠেকায়। তারুণ্য হয় দীর্ঘস্থায়ী।

পর্যাপ্ত প্রোটিনের উপস্থিতি ও চর্বি অনুপস্থিতির কারণে খেজুর শরীরের পেশি গঠন ও সুরক্ষায় খুবই কার্যকরী।

কোলন, ব্রেস্ট, ফুসফুস ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। পর্যাপ্ত আঁশ থাকায় নিয়মিত খেজুর খেলে দূর হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, পরিপাকযন্ত্র সুস্থ থাকে। হজম প্রক্রিয়া ভালোভাবে কাজ করে।

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, জিংক ইত্যাদি মিনারেল সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি শরীরের হাড়কে মজবুত রাখে। বয়সজনিত হাড়ক্ষয় রোধ করে।

স্নায়ুতন্ত্রকে সজীব ও সজাগ রাখে। দূর করে আলস্য ও অবসাদ। দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, বিশেষত বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া প্রতিরোধ করে খেজুর। এতে আছে ফ্লোরিন, যা দাঁতের সুরক্ষা দেয়।

উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে খেজুর কার্যকরী। এর আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, রক্ত পরিশুদ্ধ করে, প্রাণশক্তি দেয় এবং এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ করে।

লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুড হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীরা পরিমিত পরিমাণে খেজুর খেতে পারেন, এতে রক্তে সুগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

কোলেস্টেরল নেই বলে ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে না। পাশাপাশি দেহের গড়নকে সুন্দর করে।

তথ্যসূত্র : বায়োমেডিসিন এন্ড ফার্মাকোথেরাপি, ভলিউম ১২১, জানুয়ারি ২০২০
এনডিটিভি ফুড, ২৮ নভেম্বর ২০১৯

স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা বাড়ায়, কমায় প্রসবকালীন জটিলতা

নবী ঈসার (আ) জন্মমুহূর্ত। প্রসববেদনায় বিবি মরিয়ম আশ্রয় নিলেন খেজুর গাছের নিচে। আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পেলেন—তাজা পাকা খেজুর খাওয়ার ও পানি পানের। নির্দেশ অনুসরণের কিছু সময় পরই স্বাভাবিকভাবে ভূমিষ্ঠ হলেন ঈসা (আ)।
(গসপেল অব সিডো-ম্যাথিউ, বাইবেল; আল কোরআন : সূরা মরিয়ম ২২-২৬)

এই ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিক প্রসবের ক্ষেত্রে খেজুরের ভূমিকা নিয়ে বিশ্বজুড়ে পরিচালিত হয়েছে একাধিক উল্লেখযোগ্য গবেষণা—যেখানে প্রমাণিত হয়েছে, গর্ভাবস্থার শেষ দিকে মায়েরা নিয়মিত খেজুর খেলে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা বাড়ে এবং কমে বিলম্বিত প্রসবের হার। শুধু তা-ই নয়, গর্ভাবস্থায় খেজুর খেলে কমে মা ও গর্ভস্থ শিশুর প্রাণসংহারী জটিলতা প্রি-একলাম্পশিয়ার সম্ভাবনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের অধীন মেডিকেল ওয়েবসাইট পাবমেড-এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রথমবার মা হতে যাচ্ছেন এমন ১৫৪ জনের ওপর একটি গবেষণা পরিচালিত হয়। যেসব মা-কে গর্ভধারণের ৩৭ তম সপ্তাহ থেকে প্রতিদিন ৮০ গ্রাম খেজুর খেতে দেয়া হয়, তাদের ৬৩% পরবর্তীতে কোনো হরমোনাল ইন্জেকশন বা ওষুধের সাহায্য ছাড়াই স্বাভাবিক প্রসবে সুস্থ সন্তান জন্মদান করেন।

জর্ডান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ১১৪ জন গর্ভবতী মায়ের ওপর একটি গবেষণা পরিচালনা করে। একবছর মেয়াদি এ গবেষণায় ৬৯ জন মা-কে গর্ভাবস্থার শেষ চার সপ্তাহে প্রায় ৮০ গ্রাম খেজুর খেতে দেয়া হয়। দেখা যায়, যে মায়েরা খেজুর দেয়া হয়েছে তাদের ৯৬%-এর সন্তান তুলনামূলক সহজে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাদের প্রসববেদনার স্থায়ীত্বকাল ছিল গড়ে ৫১০ মিনিট। পক্ষান্তরে অন্যদলের মায়েরা বেলায় তা ছিল গড়ে ৯০৬ মিনিট।

২০১৩ সালে ইরানের ওমআলবেনিন হাসপাতালে একটি গবেষণা পরিচালিত হয় ১৮২ জন গর্ভবতী মা-কে নিয়ে। তাদের একদলকে গর্ভাবস্থার ৩৭ তম সপ্তাহ থেকে দৈনিক ৭০-৭৬ গ্রাম খেজুর খেতে দেয়া হয়। সন্তান জন্মদানকালে দেখা যায়, এদের প্রসববেদনা ত্বরান্বিত করার জন্যে কোনো ওষুধ ব্যবহার করতে হয় নি। অন্যদের তুলনায় তাদের তেমন কোনো জটিলতায়ও পড়তে হয় নি।

২০১৯-এ ইন্দোনেশিয়ায় পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, গর্ভাবস্থায় সাতটি করে খেজুর খেয়েছেন যারা, উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায় তাদের প্রি-একলাম্পশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার। তাই সন্তানসম্ভবা মায়েরা দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় চিকিৎসকের পরামর্শে ৭০-৮০ গ্রাম খেজুর রাখুন। বাড়বে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা। কমবে গর্ভকালীন জটিলতা, সুস্থ থাকবে নবজাতক।

তথ্যসূত্র : বায়োমেড রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল, ডিসেম্বর ২০১৯
ইরানিয়ান জার্নাল অব নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি রিসার্চ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭
জার্নাল অব অবস্টেট্রিকস এন্ড গাইনোকোলজি, ২০১৭ ও ২০১১

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

সন্তানেরা প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ খুঁজে পাবে

কাজী মোবাস্শেরা তাহেরা



নানা ধরনের ব্যথা ছিল আমার সারা শরীরে। ঘাড়, কোমর ও হাঁটুর হাড়ক্ষয়ের কারণে আমি দ্রুত হাঁটতে পারতাম না। দূরে কোথাও যেতে পারতাম না। আমার কোমরে ব্যথা হতো, জ্বালাপোড়া করত। সংসারের সব কাজের জন্যে গৃহকর্মীর ওপর নির্ভরশীল ছিলাম।

প্রতিদিন গরম পানির সেক বা হিট খেরাপি ছাড়া আমি ঘুমাতে পারতাম না। রাতে কয়েক বার ঘুম ভেঙে যেত। ঘুমের ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হতো না। দেশে-বিদেশে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। একেকজন ডাক্তার একেক রকম পরামর্শ দিতেন। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, আমি অসুস্থতার মধ্যে আটকে গেছি। আমি আর কোনোদিন ভালো হবো না। আমার মধ্যে অনেক কুসংস্কার বাসা বেঁধেছিল। আমি মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলাম।

কোর্সে এসে প্রথমদিন চেয়ারে বসতে পারছিলাম না। আমার পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল, কোথাও দু-চার ঘণ্টা আমি বসে থাকতে পারব না। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে ও মেডিটেশন করে একসময় অনুভব করলাম—আমার কোমরে, ঘাড় জ্বালাপোড়া করছে না।

প্রথমদিন কোর্স থেকে বাসায় ফিরে গরম পানির সেক ছাড়াই আমি ঘুমিয়েছি। ব্যথা-বেদনা ছাড়া একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমাতে পারব—আমার কাছে এটা ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু কোর্স থেকে প্রতিদিনই বাসায় ফিরে আমি শান্তিতে ঘুমাতে পেরেছি। ভোরে নিজে নিজেই জেগে উঠেছি তরতাজা অনুভূতি নিয়ে। এখন আমি নিজের কাজগুলো নিজেই করতে পারছি, যা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছিল না। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই।

আরো আগে কেন কোয়ান্টামে এলাম না—এজন্যে আমার আফসোস হচ্ছে। একজন মা হিসেবে বলতে চাই, আমাদের সন্তানেরা যেন অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে এবং জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, এজন্যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে তাদের অংশ নেয়া প্রয়োজন। এখানে এসে তারা প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ খুঁজে পাবে।

[অধ্যক্ষ, ভাওয়াল খ্রি-ক্যাডেট হাই স্কুল, গাজীপুর। ৪৬৫ ব্যাচ]

মেডিটেশন যেন এক শক্তি

হাবিবা আক্তার মায়ার



আমার মায়ের মাইগ্রেন আছে। তার কথা শুনে আমিও ছোটবেলা থেকে বলতাম, আমার মাথাব্যথা। ডাক্তার আমাকে বলেছেন, মাথাব্যথা কখনো ভালো হবে না। সুস্থতার জন্যে অনেক টাকা ব্যয় করেছি, কিন্তু আমি সুস্থ

হই নি। ব্যথার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে চাইতাম। সুস্থ হওয়ার জন্যে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতাম।

স্বামীর অনুপ্রেরণায় সুস্থ হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে আমি এ কোর্সে অংশ নিয়েছি। মেডিটেশন করেছি। দীর্ঘদিনের অসহ্য মাথাব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে এখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছি।

নরসিংদী থেকে প্রতিদিন চার ঘণ্টা যাতায়াত করে আমি কোয়ান্টামের ক্লাস করেছি। আগে আমি একঘণ্টা বাইরে থাকলেই মাথাব্যথা করত। স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়ু করতে পারতাম না। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়ু করছি। আমার এখন মাথাব্যথা নেই, কোনো ক্লান্তি নেই। আমি নিজেকে দেখে নিজেই অবাক!

মেডিটেশন যেন এক শক্তি! আগে বড় স্বপ্ন দেখার সাহস পেতাম না, কিন্তু এখন পারছি। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন হলো মানুষ গড়ার একটি সুন্দর প্রক্রিয়া।

[শিক্ষার্থী, বিবিএ, রায়পুরা সরকারি কলেজ, নরসিংদী। ৪৬৫ ব্যাচ]

মন থেকে ভয় চলে গেছে

পরশ রায় রাজ

কোর্সে আসার আগে ভেবেছি, দুই ঘণ্টার বেশি আমি ক্লাস করতে পারব না। এখানে এসে ভালো লাগবে, ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আমার হবে—সেটা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই আলোচনা ও

মেডিটেশন আমার ভালো লেগেছে।

ছোটবেলা থেকে একা অন্ধকার ঘরে থাকতে আমার ভয় করত। ঘরে আলো না থাকলে ঘুমাতে পারতাম না। অনেক চেষ্টা করেছি ভয় দূর করতে, পারি নি। কোর্সে ভয় দূর করার বিষয়ে আলোচনা ও মেডিটেশনের পর নিজেকে বললাম—আজ আমি পারব। ঘুমানোর সময় স্মরণ করলাম—‘আমি বিশ্বাসী। আমি সাহসী। আমি পারি। আমি করব।’ তারপর জীবনে এই প্রথম আমি বাতি নিভিয়ে একা ঘরে ঘুমাতে পেরেছি। আমি কুকুর ভয় পেতাম। রাত্তায় বের হলে কুকুর কামড় দেবে এমন মনে হতো। এখন রাত্তায় হাঁটার সময় সত্যিই আমার ভয় লাগে না। এটা আমার জন্যে বড় পাওয়া।

আরেকটি বিষয়, আমি মা-বাবার সাথে ভালোভাবে কথা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। মানুষের জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কত, তা আমি বুঝতে শিখেছি। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করে আমি জীবনকে সত্যিই বদলাতে পারব।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ। ৪৬৫ ব্যাচ]



রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি

এডভোকেট মো. নাজমুল হোসেন



আমার অনেক রাগ ছিল। পরিবারের সদস্যরা কেউ কিছু বললেই ধমকে উঠতাম। রেগে গেলে আমার হাতের কাছে যা থাকত—মোবাইল, ল্যাপটপ তা-ই ছুড়ে মারতাম। দীর্ঘদিনের সংসার জীবনে স্ত্রী ও

সন্তানদের সাথে আমার আনন্দের মুহূর্ত খুবই কম। যখন আমি রেগে যেতাম, আমার ভয়ে সন্তানেরা রুমের দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। আমার মেয়ে বলে, সে আমাকে কোনোদিন হাসতে দেখে নি।

কিন্তু কোর্সের এ কয়েকদিন তারা আমাকে হাসতে দেখেছে। আমি বাড়ি ফিরলে তারা আমার কাছে এসেছে। তারা বিস্মিত—বাবার এ পরিবর্তন কী করে হলো! এখন আমি উত্তেজিত হই না। রি-এন্ট করছি না। রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন—একথা মনে পড়লেই থ্রো-একটিভ হয়ে যাই।

গত বছর আমি লামার কোয়ান্টামম ভ্রমণ করেছি। সেখানে দেখলাম, কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শত শত শিশু সুশৃঙ্খলভাবে বেড়ে উঠছে। সবাই একসাথে খাবার খাচ্ছে, সময়মতো প্রতিটি কাজ করছে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তাদের এ সুন্দর জীবনযাপন দেখে আমি অভিভূত।

[আইনজীবী, ঢাকা জজ কোর্ট। ৪৬৫ ব্যাচ]

নিজের উপার্জনের টাকায় এ কোর্স করেছি

মনিকা আক্তার



আমি জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারছিলাম না। আমার মনে দৃঢ়তা ছিল না। লক্ষ্য স্থির ছিল না বলে আমার মনে নানা প্রশ্ন আসত—‘আমাকে দিয়ে কী হবে? আমি কখনো কিছু করতে পারব?’ কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড

কোর্সে এসে মেডিটেশন শেখার পর মনে হচ্ছে, আমার দ্বারা সবকিছু সম্ভব। পরিশ্রম করলে আমিও প্রথম হতে পারব। এখন আমার মন অনেকটা স্থির হয়েছে। আমার মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে।

আর সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে, আমি নিজের উপার্জনের টাকায় কোর্স করছি। আমি ক্লাস সেভেন থেকে টিউশনি করাই। সেই জমানো টাকা দিয়েই আমি কোর্সের ফি পরিশোধ করেছি। আমি মনে করি, মা-বাবার টাকায় কোর্স করলে আমার এতটা দায়বদ্ধতা থাকত না। কিন্তু নিজের উপার্জনের টাকা বলে এখন থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

[১০ম শ্রেণি, শ্রীবরদী এম.এন.বি.পি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরপুর। ৪৬২ ব্যাচ]

বিজয়ের অনুভূতি নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি

অধ্যাপক ড. মো. এনামুল কবীর



আমার ব্লাড প্রেশার, কোলেস্টেরল সবই স্বাভাবিক আছে। কিন্তু আমার হার্টের সমস্যা। আমি নয় জন ডাক্তার দেখিয়েছি। তারা বলেছেন, আমার এ রোগ জেনেটিক। কিন্তু আমার পরিবারের কেউ হার্টের অসুখে অল্প বয়সে মারা যান নি। তাহলে আমার কেন জেনেটিক কারণে হার্টের অসুখ হবে? এ প্রশ্নের উত্তর কোনো ডাক্তারই আমাকে দিতে পারেন নি।

কোর্সে এসে আমি প্রথমদিনই গুরুজীর আলোচনায় আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। পারিপার্শ্বিক নানা কারণে আমি যেভাবে স্ট্রেসড হয়েছি, আমার শ্বাসযন্ত্রগুলো সেভাবে শিথিল হয় নি। শ্বাসযন্ত্র সৎকৃতিত হওয়ায় দেহে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সেজন্যই আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

কোর্সে আসার আগে আমি ছিলাম পরাজিত একজন মানুষ। দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে জীবন বদলে যাবে—একথা আমি বহুব্যবহার শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করি নি। কোয়ান্টামে আমাদের জানা কথাগুলোকে বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। মনে হচ্ছে, আমি স্বাধীনতা পেয়েছি, বিজয়ের অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, যদি নিয়মিত অনুশীলন করতে পারি, তাহলে এ স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারব।

আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে এ কোর্সে তরুণদের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখে। তাদের সামনে সমস্ত বিশ্বের দুয়ার খোলা আছে। তারা নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—একদিন মনছবি তৈরি করুন। নিজেদের ভেতরে পরিবর্তন এলে দেখবেন, লক্ষ্যের বিপরীতে কোনো কাজ আমাদের সন্তানরাও করবে না।

[অধ্যাপক, এম্বোটেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৬৬ ব্যাচ]

সন্তানের জন্যেই মা-বাবার এ কোর্সে আসা উচিত

নার্গিস আক্তার



আমি টানা ১২টি শুক্রবার কোয়ান্টামের সাদাকায়নে অংশ নিয়েছি। কোয়ান্টামকে জানার আশ্রয় থেকে আমার কোর্স করা। কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে আমি আসি নি। তবে অনেক সমাধান নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

আমি সবসময় নিজেকে সুখী মানুষের কাতারে চিত্তা করেছি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমার মনে হচ্ছে, একজন শিক্ষক হিসেবে আমি এখন সুখী মানুষ গড়তেও পারব। কোর্স থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে আমার শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারব।

আমি যখন ক্লাসে পড়াতাম, শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা দেখে খুব মায়া হতো। সেইসাথে তাদের মা-বাবার প্রতি অনেক প্রশ্ন জাগত যে, তারা তাদের সন্তানদের ভালো খাবার-পোশাক সবই দেন, কিন্তু তাদের মনের ক্ষুধা কেন মেটাতে পারেন না! এখন মনে হচ্ছে, সন্তানকে পরিপূর্ণ যত্ন ও শিক্ষা দিতে মা-বাবাদের এ কোর্সে আসা উচিত।

আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিলেন আমার বাবা। তিনি আড়াই বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে বাবাকে আমি চিঠি লিখি। চিঠিগুলো জমা করে নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দেই। গুরুজীকে ধন্যবাদ যে, পরিবারের মেডিটেশনে আমি আমার বাবার স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছি। এটা আমার জন্যে অতুলনীয় এক অনুভূতি।

[শিক্ষক, অনুপম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, আজিমপুর। ৪৬৬ ব্যাচ]

পরিবারের সাথে বোঝাপড়া ভালো হচ্ছে

সানিয়া আক্তার



আমি প্রবাসে থাকি। প্রবাসী জীবন একাকিত্বের, খুব কষ্টের। আমার স্বামী একজন প্রকৌশলী। তার ব্যস্ততা আমি সহজে মেনে নিতে পারতাম না। আমি সবসময় তাকে দোষারোপ করতাম।

শ্বশুরবাড়ির সাথেও অভিমান করে আমি কোনো যোগাযোগ করতাম না।

গত পাঁচ বছরে আমি বহুব্যবহার ভেবেছি ডিভোর্সের কথা। আমার স্বামী সবসময় আমাকে বোঝাতেন, ‘ডিভোর্স কখনো কোনো সমাধান হতে পারে না। তুমি কোনো ভালো কাজের সাথে যুক্ত হও। নিজের জীবনটাকে গড়ে তোলো।’ তার কোনো কথাই আমি ভালোভাবে নিতে পারতাম না। আমি সবসময় ডিপ্রেসনে ভুগতাম।

দেশে এসে ফুপাতো ভাইয়ের পরামর্শে আমি কোয়ান্টামের অফিসে কাউন্সেলিং সেবা নিলাম এবং শুক্রবার সাদাকায়নে অংশ নিলাম। এরপর সিদ্ধান্ত নিই কোর্সটি আমি করব।

এখানে চার দিন কোর্স করার পর মনে হচ্ছে, আমি যেন নতুন একটা জীবন পেয়েছি। এখন নিজের ভুলগুলো বুঝতে পারছি। পরিবারের সাথে আমার বোঝাপড়া ভালো হচ্ছে। তরুণ-তরুণীদের বলতে চাই—কোয়ান্টামে আসুন। তাহলে জীবনটাকে সাজাতে পারবেন, সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পারবেন।

[গৃহিণী। ৪৬৬ ব্যাচ]

আবার কাজ শুরু করতে পারব

শিবরাজ চৌধুরী



কয়েক মাস আগে আমার প্রচণ্ড ব্যাকপেইন শুরু হলো। পরীক্ষা করে দেখা গেল, মেরুদণ্ডের একটা ডিস্ক নড়ে গেছে। পায়ে এবং কোমরে খুব ব্যথা হতো। সার্জারিও করাতে হয়েছে। কিন্তু সার্জারির পর আমার ব্যথা কমল না, উল্টো আরো কিছু শারীরিক জটিলতা দেখা দিল। পেইন স্কেলে ১০-এর মধ্যে আমার ব্যথা সবসময় থাকত পাঁচ থেকে সাত।

বাসার বাইরে বের হতে পারতাম না। সারাদিন খুব মন খারাপ থাকত। গত ছয় মাস যাবত আমি কোমরে বেল্ট ব্যবহার করছি। তখন ছিল আমার অসুস্থ দেহ অসুস্থ মন, কর্মহীন প্রচণ্ড দুঃখী জীবন।

রোগের বিষয়ে নিজে নিজেই কিছু পড়াশোনা করে জানলাম, এটা সাইকোসোম্যাটিক ডিজঅর্ডার। রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণার কারণে শরীরের এই পরিণতি। প্রথমদিন মেডিটেশন করার পর আমার ব্যথা কমতে শুরু করে। আমার ব্যথা এখন অনেক কম। কোমরে আর বেল্ট পরতে হয় না। অফিসেও জানিয়ে দিয়েছি, আমি আবার কাজ শুরু করব। অথচ ব্যথার কারণে গত চার মাস আমি অফিসে যাই নি। এখানে এসে আত্মবিশ্বাসী প্রোগ্রামের পথ থেকে আত্মবিশ্বাসী প্রোগ্রামের পথে আমার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

[গবেষক, আইসিডিডিআর/বি (আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ)। ৪৬৬ ব্যাচ]

অস্থিরতা দূর হয়েছে

মো. সাজ্জাদ নূর সিফাত



বর্তমানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ একটা ভাইরাসে আক্রান্ত। ভাইরাসটা হচ্ছে ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম নামক সোশ্যাল মিডিয়া।

ফেসবুকে অনেক নেতিবাচক কথা থাকে বলে তা আমি ব্যবহার করি না। তবে ইনস্টাগ্রামে আমার একাউন্ট আছে। আমি অনেক রাত পর্যন্ত গেম খেলতাম। এ কারণে পড়ালেখার প্রতি আমার কোনো মনোযোগ ছিল না।

আমার কলেজ শুরু হতো দুপুর ১টায় আর আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠতাম বেলা ১২টায়। মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করতে পারতাম না। আমার মন কখনো স্থির থাকত না। মেডিটেশন করে নিজেকে অনেক স্থির মনে হচ্ছে।

গুরুজী আমাদের অটোসাজেশন শেখালেন—‘আমি পারি, আমি করব। আমার জীবন আমি গড়ব।’ একথা শুনে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, নিজেকে আমি বদলাতে পারব, ভার্চুয়াল ভাইরাসে আর জড়াব না।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ। ৪৬৬ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : একটি বিষয় নিয়ে ইদানীং বেশ অস্থিরতার মধ্যে আছি গুরুজী। বিস্তারিত বলছি। আমি ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। কোর্স করার পর খাদ্যাভ্যাস ও সঠিক জীবনধারা সম্পর্কে আপনার আলোচনা শুনে সেভাবেই জীবনযাপন করছিলাম এবং ভালোই ছিলাম। কিন্তু বছর তিনেক ধরে কিছু ব্যস্ততার কারণে আমার দৈনন্দিন রুটিনে ছেদ পড়ে। খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম হয়। ফলে আমার ওজন বেড়ে যায়। আরো কিছু শারীরিক সমস্যাও ধরা পড়েছে। এ-ছাড়াও ডাক্তার বলেছেন আমার প্রি-ডায়াবেটিস, অর্থাৎ ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিতে আছি। পরিচিত একজন পরামর্শ দিলেন কিটো ডায়েট অনুসরণের। আরেকজন বললেন নিয়মিত রোজা রাখতে। ইউটিউবে দেখলাম—কেউ বলছে শর্করা ও ফ্যাট কম খেতে, কেউ বলছে শর্করা কম খেয়ে ফ্যাট বেশি খেতে। আবার কেউ বলছে টানা কয়েক মাস উপবাস পালন করতে, পানি ছাড়া আর কিছু পান করা বা খাওয়া যাবে না। গুরুজী, একেকজনের একেক রকম পরামর্শ শুনে কোনটি যে সঠিক, কোনটি অনুসরণ করব, সেটাই বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা পেলে উপকৃত হবো।

উত্তর : প্রথমত, অনুসরণ করবেন সেটাই, যেটা আপনার জন্যে সঠিক অর্থাৎ আপনার শরীরের সাথে সায়যুক্ত এবং সবদিক থেকে স্বাস্থ্যসম্মত। দ্বিতীয়ত, হুজুগে মাতবেন না। যা করবেন বুঝে শুনে করবেন। তৃতীয়ত, বিশ্বেজ্ঞে খাদ্যাভ্যাস ও সঠিক জীবনধারা সম্পর্কিত যেসব পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে, একটু খেয়াল করলেই দেখবেন—এগুলো আসলে কোয়ান্টাম জীবনচারণেরই মডিফায়ড বা এক্সটেন্ডেড ভার্সন অর্থাৎ পরিবর্তিত বা পরিবর্তিত রূপ।

আপনি যেহেতু বিস্তারিত প্রশ্ন করেছেন, আমিও তাই এ বিষয়ে সবিস্তারে বলছি। প্রথমে বুঝতে হবে—পৃথিবীজুড়ে গত ৪০ বছরে, বিশেষ করে গত দুদশকে এত রকম ডায়েট পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনই-বা হলো কেন?

বাংলাদেশের কথাই যদি ধরি, ৫০ বছর আগে সাধারণভাবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস কেমন ছিল? শাকসবজি, মৌসুমি ফলমূল, টেকিছাঁটা অর্থাৎ লাল চালের ভাত (হোল গ্রেইন নামে স্বাস্থ্য-সচেতন মানুষের কাছে ইদানীং যার বেশ কদর) আর বড়জোর মাছ, তা-ও প্রতিদিন নয়। মাংস কদাচিৎ। ২৫/৩০ বছর আগেও এদেশের একটি মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে সপ্তাহে কয়দিন মাংস খাওয়া হতো? দুদিন/তিন দিন, এর বেশি নয়। তা-ও খাওয়া হতো পরিমিত। কারণ অনেক ভাইবোন মিলে পরিবারে সদস্য সংখ্যা ছিল বেশি।

কিন্তু এখন? মুক্তবাজার অর্থনীতি ও পণ্যের সহজলভ্যতার দরুন আমাদের জীবনে ভোগের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। ডেইরি ও পোলট্রি শিল্প বিকাশের ফলে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের পরিমাণ বেড়েছে বহুগুণে। সচ্ছল পরিবারগুলোর খাদ্যতালিকায় মাংস এখন প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে থাকেই। কারো কারো তো থাকে প্রতিবেলার খাবারই। লাল চাল বা হোল গ্রেইনের

বদলে জায়গা করে নিয়েছে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট। উপরন্তু এখন বহু মানুষের সারাদিনের খাবারের একটা বড় অংশই কৃত্রিম ও প্রক্রিয়াজাত।

অর্থাৎ অতিভোজন যেমন বেড়েছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভুল খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল, ফ্যাট লিভারসহ নানা বিপাকীয় স্বাস্থ্যসমস্যা বা মেটাবলিক ডিজঅর্ডার ও ক্যান্সার এমনকি মনোদৈহিক জটিলতায় আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আক্রান্ত হচ্ছে, তার প্রধান কারণ অতিভোজন ও ভুল খাদ্যাভ্যাস। পাশাপাশি আছে পরিশ্রমহীন জীবনযাপন।

বেশিরভাগ মানুষই যখন এমন একটা অনিয়ন্ত্রিত অবৈজ্ঞানিক জীবনধারায় অভ্যস্ত, স্বাভাবিকভাবে রোগব্যাপিও হয়ে উঠেছে অনিয়ন্ত্রিত এবং নিরাময়-অযোগ্য। যা একশ বছর আগেও পৃথিবীতে ছিল না। অর্থাৎ জীবনচারণ যেমন হয়ে উঠেছে এক্সট্রিম বা চরম বিশৃঙ্খল, তেমনি অসুখগুলোও হয়ে উঠেছে চরম ভোগান্তিকর। একটা কঠিন অবস্থার প্রতিবাদে শরীরেরও এক ধরনের কঠিন প্রতিক্রিয়া। কিটো ডায়েট, ক্র্যাশ ডায়েট, ওয়াটার ফাস্টিং, এয়ার ফাস্টিং—এ ডায়েট পদ্ধতিগুলো শরীরের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে এক ধরনের কঠোর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। বলা যায়, বছরের পর বছর ধরে চলা অনিয়মের বিরুদ্ধে এক ধরনের চরম গুন্ডি প্রক্রিয়া বা চিকিৎসাপদ্ধতি।

এখন আসি আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে—কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবেন? অনেক তত্ত্ব অনেক সময় বেশ হইচই ফেলে দেয়, যা পরে অস্বাস্থ্যকর ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ তার পেছনে থাকে কিছু স্থূল বাণিজ্যিক স্বার্থ। যেমন : ১৯৬৭ সালে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত একটি রিপোর্টে হৃদরোগের কারণ হিসেবে প্রধানত দায়ী করা হয় ফ্যাট বা চর্বিযুক্ত খাবারকে, কিন্তু পুরোপুরি আড়াল করা হয় এসব রোগের পেছনে চিনির ভূমিকা। এর অর্ধশতাব্দী পর ২০১৬ সালে জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন ইন্টারনাল মেডিসিন-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী চিনি ব্যবসায়ীদের অর্থপুষ্ট হয়ে কীভাবে এই ‘তত্ত্ব’ উদ্ভাবন (!) করে। অতএব কোন কথা, কে, কেন বলছে—সেটা বুঝতে হবে।

শুরুতে যা বলছিলাম—নানারকম ডায়েটের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যেসব পদ্ধতি, তাতে সার্বজনীনভাবে পালনীয় যে বিজ্ঞানসম্মত অনুঘটকগুলো রয়েছে, তার সবই আমরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আলোচনা করছি গত সিকি শতাব্দীরও আগে থেকে। সেই নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় আমরা যখন বলেছি—‘বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যত খাদ্য উপাদান আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো চিনি’—তখন পর্যন্ত এদেশের কোনো পত্রিকা বা মিডিয়ায় এ-সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদনই প্রকাশিত হয় নি।

কোয়ান্টামের শুরু থেকেই আমরা বলেছি ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়সহ সবরকম প্রক্রিয়াজাত-প্যাকেটজাত খাবার ও অতিরিক্ত তেল-চর্বি-ভাজাপোড়া খাবার বর্জনের কথা। অন্যদিকে তাজা ফলমূল, শাকসবজি ও প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ার কথা বলেছি। যেসব খাবার কাঁচা খাওয়া যায় তা সালাদ হিসেবে কাঁচা খেতে বলেছি। আজ বিশ্বেজ্ঞে সচেতন

মানুষ সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে এ নিয়মগুলোই অনুসরণ করছে।

সম্প্রতি প্রথম আলো অনলাইনে (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০) দেশের একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. জাফর মাসুদের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে—‘জীবনচারণ বদলে এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্সার রোধ করা সম্ভব’। পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলতে পারি, তিনি যে পরামর্শগুলো সেখানে দিয়েছেন, আমরা সে কথাগুলোই বলছি এবং নিজেরা চর্চা করছি গত কয়েক দশক ধরে।

সারা পৃথিবীতে এখন মেডিটেশন, ইয়োগা নিয়ে কী মাতামাতি আর হইচই! অথচ সুস্থতার জন্যে এসব চর্চার গুরুত্ব নিয়ে আমরা সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছি সেই ১৯৮৩ সাল থেকে, যোগ মেডিটেশন কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

আর আত্মশুদ্ধি ও সুস্থতার জন্যে রোজা বা উপবাস পালনের বিধান তো সব ধর্মে শুরু থেকেই ছিল। এ-ছাড়াও অমর চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা তার বহু ক্রনিক রোগীকে টানা তিন সপ্তাহ রোজা রাখার পরামর্শ দিতেন। বছর কয়েক আগে জাপানি গবেষক ইউশিনোরি ওসুমি রোজা বা উপবাস নিয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কারও পেলেন। কিন্তু রোজা যে দেখে ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বাড়ায়, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, মস্তিষ্কের জন্যে ভালো—এগুলো তো আমরা ৩০ বছর ধরে বলে আসছি। এ নিয়ে কোয়ান্টাম বুলেটিনের অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যায় ‘রোজা পালন করুন, রোগ থেকে বাঁচুন, অটুট রাখুন অনন্ত যৌবন’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীতে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন (পৃষ্ঠা ৭৯) বইতে সংকলিত হয়েছে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি, রোগ প্রতিরোধ ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে কোয়ান্টাম জীবনচারণ আদর্শ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত। আর বিশেষ ডায়েট বা বিশেষ জীবনযাপন পদ্ধতি কেউ চর্চা করতেই পারেন, কিন্তু সেটা বিশেষ কোনো রোগের প্রেক্ষিতে; নিশ্চয়ই সবার জন্যে নয়।

তবে যা-ই করবেন, অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে করবেন। কারণ জীবনের একটা বড় সময় নির্দিষ্ট এক ধরনের খাদ্যাভ্যাসে আপনি অভ্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ আরেক ধরনের খাদ্যাভ্যাস আয়ত্ত করতে গেলে সাময়িক উপকার হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা শরীরের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। তাহলে পরিবর্তনটি বিজ্ঞানসম্মত হবে, সুন্দর হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

অবৈজ্ঞানিক ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ
জীবনযাপন দুঃখ ও
দুর্ভোগের কারণ। আমি
জীবনযাপনের বিজ্ঞান
অনুসরণ করব।



এতিমান কার্যক্রম ৯ সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগে বদলে যাচ্ছে হাজারো জীবন

এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে থাকবেন নবীজীর (স) পাশে। একথা বলেছেন স্বয়ং নবীজী (স)। এ শিক্ষাকে সামনে রেখে ২০১৮ সালে ফাউন্ডেশন উদ্যোগ নেয় এতিমান কার্যক্রমের। এর আওতায় এককভাবে বা কয়েকজন মিলে এক বা একাধিক এতিমের দায়িত্ব নেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় আড়াই হাজার বঞ্চিত শিশু-কিশোর যে মমতা ও আধুনিক শিক্ষায় সুনামগরিক হিসেবে বেড়ে উঠছে কোয়ান্টামমে, তার অন্যতম অর্থায়ন-উৎস এই এতিমান কার্যক্রম।

এ শিশুরা গড়ে উঠছে দেশ ও জাতির সম্পদ হিসেবে। একেকজনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে প্রতি মাসে খরচ হয় আট হাজার টাকা। কেউ কেউ সারা বছরের খরচ একত্রে ৯৬ হাজার টাকা দান করেও এতিমান কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন বিপদমুক্তি, সার্বিক কল্যাণ এবং মৃত মা-বাবার আত্মার মাগফেরাত কামনায়। ২০১৯ সালে এতিমান ফান্ডে সংগ্রহ ছিল ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৯৬ টাকা। ২০১৮ সালে এ সংগ্রহ ছিল পাঁচ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৪১ টাকা। গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি এসেছে ১৬১%।

সৃষ্টির সেবায় সার্থক ২০১৯

ক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	২০১৯	২০১৮	হ্রাস/ বৃদ্ধি	শুরু থেকে ২০১৯
১	মোট রক্তদাতা (জন)	৩৩,১১৯	২৯,২১৫	৩,৯০৪	৩,৭৭,০৭৮
২	মোট রক্ত সংগ্রহ (ল্যাব + ক্যাম্প)	৬৭,৪৪৬	৬০,৩৮০	৭,০৬৬	৭,৪৬,৮৩৫
৩	মোট রক্ত সরবরাহ (ইউনিট)	১,১৪,৮৯৪	১,০৮,১১৪	৬,৭৮০	১১,৬৪,৫০১
৪	রক্তদান সেবা (ল্যাব ও ক্যাম্প ব্যতীত) (জন)	২,৮২৯	৩,২৩২	-৪০৩	৫৬,৯৫২
৫	টিউবওয়েল/ ইঁদারা/ পানির ট্যাংক স্থাপন (টি)	১০	৭	৩	৩৯৮
৬	মাতৃমঙ্গল (জন)	৩,২৫৫	২,৭৯৫	৪৬০	১১,৯১২
৭	সুনতে খতনা (জন)	১৫,১৯৮	১২,৮৮৬	২,৩১২	১,৯৬,২৬৮
৮	রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ (শিক্ষার্থী)	২০১	২৩৯	-৩৮	১,০৫৭
৯	সাদাকায়নে হিলিং (সদকা ব্যতীত) (টি)	৪,০০,৭১১	৩,৮৮,২৩৭	১২,৪৭৪	২৪,২৫,৬৮৫
১০	কোয়ান্টাম উইশবোর্ড হিলিং (টি)	৭,৯৬,২২৫	৮,১৪,৮৮৪	-১৮,৬৫৯	২৫,৭৪,৯৭৫
১১	বেওয়ারিশ লাশ দাফন/ সংকার (জন)	৫৪	৩৯	১৫	৫৬৭
১২	বস্ত্র সংগ্রহ ও দান (টি)	৮,৮৩৫	১৩,১৫৪	-৪,৩১৯	১,৫৭,৯৯৩
১৩	বৃক্ষরোপণ (টি)	৯৪,০৩৮	৭৪,০৫৪	১৯,৯৮৪	৬,৫২,৫৩৭
১৪	কোয়ান্টাম মেডিকেল ক্যাম্প সেবাদান (জন)	৬,১৭৫	৩,২১১	২,৯৬৪	২০,৭৫৮
১৫	অন্যান্য চিকিৎসাসেবা (জন)	৭১,৪২৯	৬৪,৪৭৩	৬,৯৫৬	৩,৪৪,৫৩৪
১৬	রাজবিলায় চক্ষু চিকিৎসাসেবা (জন)	৩,৫৮৬	১,৫৫৬	২,০৩০	৫,১৫৫
১৭	ছানি অপারেশন (জন)	৩০৫	২১৭	৮৮	৬৪৮
১৮	গৃহকর্মী চিকিৎসাসেবা (জন)	৫৫৯	৮১৭	-২৫৮	২,৫৪৪
১৯	পশু চিকিৎসাসেবা (টি)	১৮৬	০	১৮৬	১৮৬
২০	আশ্রয়মমে সেবার্থী (জন)	২১	১৮	৩	৪৫

চিকিৎসাসেবা

বান্দরবান কোয়ান্টামমে দিনব্যাপী চিকিৎসাসেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ৪ জানুয়ারি ২০১৯। ক্যাম্পে সেবা প্রদান করেন কোয়ান্টাম পরিবারের ১২৯ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (পুরুষ ৫৩ জন ও মহিলা ৭৬ জন)। মেডিসিন, সার্জারি, নিউরোসার্জারি, নাক-কান-গলা, নিউরোলজি, হৃদরোগ, অর্থোপেডিকস, দন্ত, চর্ম, নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, চক্ষু, ফিজিওথেরাপি, গাইনি ও শিশুসহ মোট ১৫টি বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ৬,১৭৫ জন দুস্থ বঞ্চিত পাহাড়ি-বাঙালি রোগী। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় দুই লক্ষাধিক ইউনিট প্রয়োজনীয় ওষুধ।



মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন এক পাহাড়ি প্রবীণ

স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

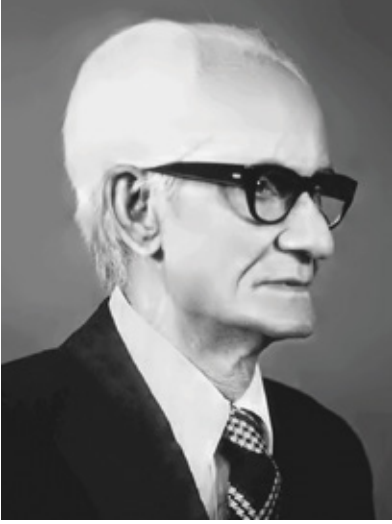
- ☐ ২০১৯ সালে সারাদেশে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া হয়েছে ২২০ জনকে।
- ☐ সেলাই প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৯ জন, সেলাই মেশিন পেয়েছে ২২ জন।
- ☐ গৃহনির্মাণ করে দেয়া হয় গৃহহীন ২৯টি পরিবারকে।
- ☐ ঋণমুক্তির জন্যে অর্থ সাহায্য পেয়েছে ৪৯ জন। বন্ধকী ঋণমুক্ত হয়েছে একজন।
- ☐ সিএনজি/ রিকশা/ অটোবাইক কিনতে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছে তিন জনকে।
- ☐ মুরগির খামার, গরুভাগাসহ স্বনির্ভরায়নে অর্থ দেয়া হয়েছে ১,৪৬১ জনকে।

বছরজুড়ে পরিচরিত করসেবা

২০১৯-এ বনশ্রী সেন্টারের উদ্যোগে পরিচরিত করসেবা অনুষ্ঠিত হয় ৫ জানুয়ারি, ৯ মার্চ এবং ২৭ এপ্রিল। এ-ছাড়া ৯ মার্চ সুপ্রীম কোর্ট বার প্রাঙ্গণে, ৮ ফেব্রুয়ারি সিলেটের আম্বরখানা, ১৩ সেপ্টেম্বর লামা, ২৩ মার্চ বান্দরবানের রাজবিলা এবং কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কলেজে করসেবা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ এপ্রিল পরিচরিত করসেবায় অংশ নেন ৪৫ জন কোয়ান্টিয়ার। ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ২৫ মার্চ পরিচরিত করসেবায় অংশ নেন ৮৭২ জন কোয়ান্টিয়ার।

নিজের কাজ, দর্শন ও অবদান দিয়ে পৃথিবী ও সভ্যতাকে ঋণী করে গেছেন যারা—তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গুরুজী আলোকপাত করছেন ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রমগুলোতে। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হচ্ছে কোয়ান্টাম বুলেটিনের ধারাবাহিক এ আয়োজনে—

বাংলাদেশে আধুনিক মনোচিকিৎসার পথিকৃৎ প্রফেসর ড. এম ইউ আহমেদ



প্রফেসর ড. এম ইউ আহমেদ
(১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ – ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮)

সময়কাল ১৯৪৬। কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকেরা এক রোগীকে নিয়ে বেশ বিপদে পড়লেন। সেই মহিলা তিন বছর ধরে প্যারালাইজড। সবরকম চেষ্টা করে শেষমেশ চিকিৎসকেরা রায় দিলেন, এ রোগ আর ভালো হবে না। সেসময় এক বাঙালি মনোবিদের উদ্ভাবিত মনোচিকিৎসা পদ্ধতি মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি ভারতে বেশ জনপ্রিয়। চিকিৎসকেরা শেষ চেষ্টা হিসেবে রোগীকে পাঠালেন তার কাছে।

হিমালয়ান রেলওয়ের চিফ মেডিকেল অফিসার এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে সেই মনোবিদ রোগীকে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি দেয়া শুরু করলেন। সপ্তম সেশনে রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে চেয়ার থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা এতই কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, দার্জিলিংয়ে তার একটি বাড়ি উপহার হিসেবে লিখে দেন সেই মনোবিজ্ঞানীকে। এ ঘটনার ২৪ বছর পরও সেই ভদ্রমহিলা তাকে চিঠি লিখে জানান যে, তিনি সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

আর এই মনোচিকিৎসক হলেন আমাদের দেশেরই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ প্রফেসর এম ইউ আহমেদ; যিনি খানকা এবং আশ্রমের চৌহদ্দি থেকে ধ্যানকে নিয়ে আসেন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের দৈনন্দিন চর্চায়। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি এ-ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ছিল তার ১১১ তম জন্মদিন।

এম ইউ আহমেদের জন্ম ব্রিটিশ শাসনাধীন তৎকালীন পূর্ব বাংলার বরিশালে। ১৯৩৩-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন-মনোবিজ্ঞানে মাস্টার্স সম্পন্ন

করেন। উল্লেখ্য, তখন দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান মিলিয়ে একটি বিষয় ছিল। ১৯৩৫-এ ভারতের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। পরের পাঁচ বছর কাজ করেন হিপনোসিস বা সম্মোহনবিদ্যা নিয়ে। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় তার কালজয়ী গ্রন্থ *লার্ন টু হিপনোটাইজ এন্ড কিউর*।

মানবকল্যাণে মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি

উপরোক্ত বইটি প্রকাশের পর এম ইউ আহমেদের চিন্তায় পরিবর্তন আসতে থাকে। এলাহাবাদ ছেড়ে তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে। অধ্যাপনা এবং হিপনোসিস ছেড়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা সাইকোথেরাপিতে মনোনিবেশ করেন।

দীর্ঘ গবেষণায় তিনি উপলব্ধি করেন, পাশ্চাত্যে সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে সাইকিয়াট্রিস্টরা। কারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে শুনে তাদের জীবনটাও দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে যায়। দুঃখের ভারে কোনো কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট নিজেই আত্মহত্যা করে।

এম ইউ আহমেদ ভাবলেন, আমাদের মুনি-ঋষি, অলি-বুজুর্গ-সাধকদের কাছেও মানুষ দুঃখ-কষ্টের কথাই বলতে আসে। কিন্তু মানুষ তাদের কাছ থেকে ফিরে যায় আনন্দ ও সুখানুভূতি নিয়ে। কারণ তারা শান্তির আকর। মানুষের কষ্টের কথা শুনে কোনো বুজুর্গ পাগল হয়েছেন, এমন ইতিহাস নেই; বরং মানুষকে কল্যাণকর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সুপারামর্শ দেয়ার ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা আরো উজ্জীবিত হন।

১৯৪০-৪৭ সাল পর্যন্ত এম ইউ আহমেদ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন, রোগীকে যদি শিথিল করে ধ্যানাবস্থায় বা মেডিটেটিভ লেভেলে নেয়া যায়, তাহলেই নিরাময় সম্ভব। হিপনোটিক লেভেলে নেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রাচীন ভারতের যোগ এবং সুফিদের আত্মিক দর্শনের মিশেলে তিনি মনোদৈহিক রোগ নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন—মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি, যা মেডিটেশন ও অটোসাজেশনের সমন্বয়ে সাজানো। উল্লেখ্য, নিরাময়ের ল্যাটিন প্রতিশব্দ মেডেরি। মেডিটেশন এবং মেডিসিন দুটো শব্দই এসেছে মেডেরি থেকে।

তার খ্যাতি চারদিকে আরো ছড়িয়ে পড়ল যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভাই ব্রিজলাল নেহরু তার কাছে চিকিৎসা নিতে এলেন। ব্রিজলাল নেহরু ছিলেন উচ্চ রক্তচাপের রোগী। এম ইউ আহমেদের সাইকোথেরাপিতে তিনি ভালো হয়ে গেলেন। পণ্ডিত নেহরুর ভাই ভালো হয়েছেন—এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উত্তর ভারত, লক্ষ্মী, দিল্লি, মাদ্রাজ ও রাজস্থানের রোগীরা তার চেম্বারে ভিড় জমাতে শুরু করল। ভারতের অন্যতম সেরা সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন তিনি।

এম ইউ আহমেদ ছিলেন বরাবরই নীতিবান এবং পরোপকারী একজন মানুষ। তার জনপ্রিয়তার অন্যতম

কারণ ছিল, কোনো শিক্ষার্থী বা স্থানীয় মানুষ যখনই অসুবিধায় পড়েছেন, তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। সাহায্যপ্রার্থী হিন্দু না মুসলমান, বাঙালি না অবাঙালি—কখনো সে ভেদাভেদ করেন নি। তিনি ছিলেন সদাচারী ও সদালাপী। সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন। যে কারণে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েও সবাই তাকে সমীহ করে চলতেন।

দেশে ফিরে আসার পর এম ইউ আহমেদ চটগ্রাম কলেজে যোগ দেন। ১৯৫৭-৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন।

প্রবীণতম সদস্য হিসেবে ১৯৬৭ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান হওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান তার চার বছরের জুনিয়র একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলেন। এর প্রতিবাদে এম ইউ আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, জীবনে কখনো কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করবেন না। বাকি জীবন তিনি এ সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগে সুপারনিউমেরারি অধ্যাপক পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

একজন দূরদর্শী মনোবিজ্ঞানী

কোয়ান্টামের জনপ্রিয় অটোসাজেশন সূত্র *দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন* মূলত এম ইউ আহমেদ প্রণীত *লিভ লং হ্যাপি স্ট্রং থো ইয়ং*-এরই বাংলা মর্মার্থ। কোয়ান্টাম ৩০ বছরের চেষ্টায় এ অটোসাজেশনের বাংলা মর্মার্থ করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি কতটা দূরদর্শী ছিলেন।

মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি অর্থাৎ ধ্যানকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। যারা এভাবে পথ দেখাতে পারেন, প্রচলিত সংস্কারের বৃত্তকে ভাঙতে পারেন, তারাই পারেন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই আজন্ম লালিত সংস্কারের বৃত্তে আটকা পড়ে যায়, বৃত্ত ভাঙতে চায় না। এম ইউ আহমেদ কখনো সংস্কারের বৃত্তে আটকা পড়েন নি; বরং যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন, কল্যাণকর বলে ভেবেছেন, সে কাজটিই তিনি করেছেন।

তাই আজও তিনি একইভাবে সমাদৃত ও স্মরণীয়। ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন মনোচিকিৎসায় যুগশ্রুষ্ঠা এই সাধক। আমরা তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি।



প্রফেসর এম ইউ আহমেদের
জীবন ও কর্ম সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে—

obituary.quantummethod.org.bd